Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual
Peer Reviewed (Double Blind Referred)
Bi-Annual Research e-Journal

Volume-5 Issue-1 July 2026
International e-ISSN 2583-6706
Website
santiniketansahityapath.org.in

INDEXED IN INTERNET ARCHIVE | GOOGLE SCHOLAR | ORCID | SCRIBD | ACADEMIA

DOI https://doi.org/10.67841/pgp.260501076 OPEN ACCESS

IIFS Impact Factor 3.75 SJIF Impact Factor 3.481

Poetry by Alok Ranjan Dasgupta: Types and Content

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের কবিতার বিষয় ও প্রকরণ

Romio Sarkar
Researcher
Bengali Department
Visva-Bharati

Received on: 16th May 2026
Accepted on: 29th May 2026

Abstract:

Alokeranjan Dasgupta (1933–2020) stands as one of the most significant poets in modern Bengali literature of the 1950s. He was, simultaneously, a poet, a contemplative essayist, and a translator; and on the other hand—a researcher, a discerning critic, and a professor. He was born in Kolkata on October 6, 1933. His childhood education and early life were spent in Rikhia and Santiniketan. Subsequently, he began his professional career as a professor in the Department of Comparative Literature at Jadavpur University; later, he dedicated himself to teaching at the University of Heidelberg in Germany, where he remained until the very last day of his life.

He authored more than twenty volumes of poetry. His renowned collections include 'Joubanbaul' (1959), 'Nishiddha Kojagari' (1374), 'Gillotiner Alpana' (1384), 'Jababdehir Tila' (1982), 'Dhulo Makha Etherer Jama' (1999), 'Shune Elam Satya Pirer Hate' (2001), 'Pranita Agni Kake Bole Tumi Jano' (2011), 'Se Ki Khunje Pele Ishwar Kana' (2012), 'Shuktarar Aloy Pori Biporjoyer Chithi' (2017), and 'Bastuharar Pahartali' (2020), among others. Notably, he was honored with the Sahitya Akademi Award in 1992 for his poetry collection 'Marami Karat' (1397). Additionally, his volumes of essays include 'Shilpita Swabhav' (1970), 'Bhramane Noy Bhubane' (1988), 'Dwitiya Bhuban' (1991), 'Sharannarthir Ritu O Shilpabhavna' (1993), and 'Amader Santiniketan' (2000).

In his poetry, the sense of life, the consciousness of mortality, and contemplations on the Divine are inextricably interwoven. The poet's aesthetic sensibility is profoundly and organically intertwined with his spiritual consciousness. Notably, a profound sense of religiosity and contemplation of the Divine constitute one of the defining characteristics of his poetic style. Moving away from the exuberant, 'Baul'-inspired

© Santiniketan Sahityapath

cadences of his early years, he eventually attained — in his maturity — a state akin to solitary, deep meditation. He remained, throughout his life, a true magician of words; indeed, he delighted in playing with language. In crafting the language of his poetry, he not only employed a blend of 'Tatsama' (Sanskrit-derived) and colloquial vocabulary but also presented the technical terminologies of science, sociology, and philosophy in a remarkably intimate and accessible manner. In both the thematic content and formal structure of his verse, the themes of exile and alienation—particularly as experienced by refugees and displaced persons—along with a distinct resonance of global consciousness, emerge as the dominant poetic idiom—his unique artistic signature.

Furthermore, given that he spent a significant portion of his life abroad, the linguistic landscape of his poetry arguably exhibits a distinct "diasporic" sensibility; simultaneously, transcending the anguish of personal separation, his identity as a global citizen manifests itself with compelling force. Moreover, one might reasonably surmise that his extensive translations of diverse poems from world literature served to enrich the very structure and texture of his own poetic compositions, infusing them with the essence of global literary traditions. In crafting his concise, short-form poems, he elevated the use of language to a level bordering on reverence—a realm where poetry ceases to be merely an object of reading, transforming instead into an intimate art of pure, profound experience.

Key Words:
Bauls, refugees, God, the universe, beauty, artistic philosophy, mythology, music, mother tongue, masks.

মূল প্রবন্ধ

'ভগবানের গুপ্তচর মৃত্যু এসে বাঁধুক ঘর
ছন্দে, আমি কবিতা ছাড়ব না,
অপ্রসর সমুদ্রকে শামুক দেখুক প্রেমের চোখে
বিমাতা মাটি তার কাছে যাব না।
ধরিত্রীর নীবিবন্ধে জগৎ যদি মহানন্দে
অন্ধ, আমি প্রহরী যন্ত্রণা।
মানুষ গেলে নামের খনি আমার পরে এই ধরণী
জ্যোপনে অলোকরঞ্জনা॥'[১]

উপরিক্ত কবিতাটিতে কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের এক প্রগাঢ় আত্মপ্রত্যয়ী কবি সত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। শিল্পের প্রতি তাঁর গভীর নিষ্ঠা ও অনমনীয় মনোভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। জীবনে মৃত্যু চিরন্তন সত্য, কখন কীভাবে ভগবানের গুপ্তচর রূপে মৃত্যুর আগমন হবে তা কেউ জানে না। কিন্তু সেই মৃত্যুও কবির সৃষ্টিশক্তিকে থামাতে পারে না। কবির কাছে কবিতা শুধু শিল্প নয়, অস্তিত্বেরই আরেক নাম। তাই মৃত্যু এসে ঘর বাঁধলেও কবি কবিতাকে ছাড়বেন না। কবিতাটির শেষ পংক্তিতে কবি শব্দ নিয়ে অসাধারণ একটা খেলা খেলেছেন। স্রষ্টা চলে গেলেও সৃষ্টি থেকে যায় মানুষের মনে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো তিনিও মনে করেন 'নামের খনি' অর্থাৎ কবির রচিত সোনার ফসল মানুষের মনে থেকে যাবে। ব্যক্তি অলোকরঞ্জন চলে গেলেও তাঁর সৃষ্টি আর যন্ত্রণার 'আলো' পৃথিবীর গভীরে গোপনে থেকে যাবে। পৃথিবী তখন তাঁর সেই সৃজন-আলোকে নতুন করে রঞ্জিত হবে। তাই নিজের নাম অলোকরঞ্জন-এর

© Santiniketan Sahityapath

সঙ্গে আলোর রঞ্জনাকে মিলিয়ে দিয়ে চমৎকার শব্দ সৃষ্টি করেছেন 'অলোকরঞ্জনা'। কবি ব্যক্তি সত্তা ও সৃষ্টি সত্তা দুটোকেই তিনি 'অলোকরঞ্জনা' শব্দের ব্যবহার করে মিলিয়ে দিয়েছেন বলেই আমার মনে হয়।

কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের কবিতায় বিষয়ে মধ্যে ঈশ্বর চেতনার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাঁর ঈশ্বর কোনো প্রথাগত ধর্মীয় দেবতা নন; বরং তিনি মানুষের অন্তর্জগৎ, বেদনা, প্রেম, শূন্যতা ও অস্তিত্বের গভীরে অনুভূত এক রহস্যময় সত্তা। তাঁর কবিতায় ঈশ্বরচেতনা কখনো আধ্যাত্মিক, কখনো মানবতাবাদী, আবার কখনো প্রায় প্রেমিকের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। আমার মতের স্বপক্ষে তাঁর 'যৌবনবাউল' কাব্যগ্রন্থের বিখ্যাত একটি কবিতা থেকে কিছুটা অংশ আমরা উদ্ধৃতি হিসেবে ব্যবহার করব,

"বন্ধুরা বিদ্রুপ করে তোমাকে বিশ্বাস করি ব'লে;
তোমার চেয়েও তারা বিশ্বাসের উপযোগী হ'লে
আমি কি তোমার কাছে আসতাম ভুলেও কখনো?
...
এখনো তোমাকে যদি বাহুডোরে বুকের ভিতরে
না-পাই, আমাকে যদি অবিশ্বাসে দুই পায়ে দ'লে
চ'লে যাও, তাহলে ঈশ্বর
বন্ধুরা তোমায় যেন ব্যঙ্গ করে নিরীশ্বর ব'লে।।"[২]

কবিতাটির মধ্যে একনিষ্ঠ আত্মনিবেদিত ভালোবাসা ও বিশ্বাসের মাধ্যমে কবি প্রিয়জনকে ঈশ্বরের জায়গায় বসিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে যায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি পংক্তির কথা, "দেবতারে যাহা দিতে পারি দিই/ তাই প্রিয়জনে, প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই/ তাই দিই দেবতারে — আর পাব কোথা!/ দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।।"[৩] কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের কবিতার বিষয় ও ভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভাব প্রায়ই ঘুরে ফিরে এসেছে।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের কবিতা শুধু বিষয়বস্তুর দিক থেকেই নয়, প্রকরণ ও কাব্যশৈলীর দিক থেকেও অত্যন্ত অভিনব। তাঁর কবিতায় একদিকে যেমন গভীর মননশীলতা, পৌরাণিক ও দার্শনিক চেতনা দেখা যায়, তেমনি অন্যদিকে নতুন শব্দের ব্যবহার, চিত্রকল্পের বৈচিত্র্য এবং গঠনরীতির অভিনবত্ব লক্ষ করা যায়। চমকপ্রদ শব্দ তৈরির ক্ষেত্রে তিনি সমাসবদ্ধপদ এবং উপসর্গের বহুল প্রয়োগ করেছিলেন। যেমন, 'শ্যাওলাঝিনুকশামুক', 'অক্ষরব্রহ্ম', 'পুষ্পালিবাহার', 'অলোকরঞ্জনসংযোজিত', 'অমৃতধামযাত্রী', 'সুবিবাহিত', 'অবিবেকী' প্রভৃতি। এই বিষয়টিকে প্রমাণ করার জন্য তাঁর একটি কবিতা থেকে কয়েকটি পংক্তি আমারা উদ্ধৃতি হিসেবে ব্যবহার করব।

"দিন যেখানে অনন্যোপায়
রাতজোনাকি গুঁজে দেব আমি তোমার
বিনোদ-খোঁপায়"[৪]

কবিতাটির অবয়ব কাঠামোর দিকে আমরা যদি লক্ষ করি তবে দেখতে পাবো কবির কবিতা রচনা ক্ষেত্রে প্রকরণ ভাবনা কতটা নান্দনিক ভাবাপন্ন। কবিতায় ব্যবহৃত 'রাতজোনাকি' শব্দটি সাধারণত ক্ষণস্থায়ী আলোর প্রতীক অনেকটা নরম, রহস্যময় জাদুকরী আলোর মতো কিন্তু কবি সেই অর্থে একে ব্যবহার করলেন না। তিনি 'রাতজোনাকি' শব্দটিকে প্রেমের অনুসঙ্গে একজন প্রেমিক যেভাবে প্রেমিকার চুলে পরম অন্তরঙ্গ ও গভীর ভালোবাসায় যত্ন নিয়ে ফুল গুঁজে দেয় সেই অর্থে ব্যবহার করেছেন। শুধু এখানেই নয় আবার 'বিনোদ-খোঁপা' শব্দের খোঁপার বিশেষণ হিসাবে 'বিনোদ' শব্দটির উল্লেখ করে সুন্দর ও সাজানো খোঁপাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন কবি। এই কবিতাটিতে কবি একদিকে যেমন 'বিনোদ-খোঁপায় 'শব্দটির ব্যবহারে করে সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছেন ঠিক তেমনি 'অনন্যোপায়', 'রাতজোনাকি' প্রভৃতি সমাসবদ্ধ শব্দের ব্যবহার করে চমৎকারিত্ব ও নান্দনিকতার পরিবেশ তৈরি করছেন। সহজ কথায় বলা যেতে

© Santiniketan Sahityapath

পারে যে কবি প্রেমিকাকে রাতের অন্ধকারে জোনাকির নরম আলোয় সাজিয়ে তুলতে চান। এটি শুধু শারীরিক সৌন্দর্য নয়, বরং প্রেমের সাহায্যে অন্ধকারকে আলোকিত করার মাধ্যমে ক্ষণস্থায়ী মুহূর্তকে চিরন্তন করে তুলবার প্রয়াস। জোনাকির আলো যেমন অন্ধকারকে ছুঁয়ে যায় কিন্তু গ্রাস করে না, ঠিক তেমনি কবির প্রেমও অধিকারবোধহীন এবং মায়াময়।

প্রত্যেক মহৎ কবি তাঁর কবিতার প্রয়োজনে শব্দের নির্বাচন, শব্দের অর্থ গত পরিবর্তন, ছন্দ, অলংকার, চিত্রকল্প ইত্যাদি ব্যবহার করে নিজস্ব কাব্যভাষা শৈলী বা Signature রেখে যায়। এক্ষেত্রে কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তও তার ব্যতিক্রমী নন। এই বিষয়ে কবি একটি সাক্ষাৎকারে আমাদের জানিয়েছেন যে —

> **আমি যেমন বিশ্বাস করি, দান্তের মতো কবি আর জন্মাননি। এক-একটা আগুনে পুড়ছেন তিনি, পুড়তে পুড়তে লিখছেন। পাশাপাশি পোপের সঙ্গেও লড়ছেন। একইসঙ্গে তিনি মাতৃভাষা সৃষ্টি করছেন। প্রত্যেক কবিকে তাঁর মাতৃভাষা সৃষ্টি করতে হয় নতুন করে। এখন বাংলা ভাষার যে-দশা হয়েছে, 'সাংবাদিক বাংলা ভাষা'-র, ভাষাটাকে সৃষ্টি করলে তাকে 'পাগল' বলে চিহ্নিত হতে হবে! কিন্তু এই চ্যালেঞ্জটা মারাত্মকরকম একটা ব্যাপার।**[৫]

মাতৃভাষা তৈরি করা প্রত্যেক কবির কাছেই একটা চ্যালেঞ্জের ব্যাপার। ইতালিয় ভাষায় মহাকবি দান্তে যেমন ব্যক্তিগত জীবনে চরম প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিয়ে গিয়েও নিজস্ব ভাষা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তেমনি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও শব্দের নিত্যনতুন অর্থের ব্যবহারে, ছন্দ ও অলংকারের সুষম প্রয়োগে এবং বাকপ্রতিমা নির্মাণের মধ্যে দিয়ে নিজস্ব মাতৃভাষা সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

কবিতার প্রকরণ শিল্পের মধ্যে বিশেষত চিত্রকল্প নির্মাণেও কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত অভিনবত্বের দাবি রাখে। তাঁর কবিতায় প্রকৃতি-মানুষ-পুরাণের সমন্বয় এবং বৈপরীত্যের সংঘাতের মাধ্যমে চিত্রকল্প গড়ে ওঠে। তাঁর কবিতা শুধু আবেগপ্রবণ নয়, বরং দৃশ্য, শব্দ ও ধারণার জটিল সংযোগে এক অনন্য চিত্রময় জগৎ সৃষ্টি করে। আমরা এই বিষয়টিকে বুঝে নেওয়ার জন্য উদাহরণ হিসেবে তাঁর 'যৌবন বাউল' কাব্যগ্রন্থের 'নির্জন দিনপঞ্জী' কবিতা থেকে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃতি হিসেবে ব্যবহার করব।

"উদাসীন মেঘে মেঘে ফুটে আছে থোকা-থোকা
আরক্তকরবী:
সমস্ত আকাশ যেন গগনেন্দ্র ঠাকুরের ছবি।
ধানকলে কাজ সেরে এই বার ঘরে ফেরে
সাঁওতালি মেয়েরা ঝাঁকে-ঝাঁকে,
দাদারিয়া গানে-গানে সে-করবী তুলে আনে
খোঁপার ফণায় গুঁজে রাখে।"[৬]

উদ্ধৃত কবিতাংশে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত অত্যন্ত অভিনব চিত্রকল্প নির্মাণ করেছেন। অল্প কয়েকটি পঙ্‌ক্তির মধ্যেই তিনি প্রকৃতি, শিল্প ও লোকজ জীবনের এক অনন্য সমন্বয় গড়ে তুলেছেন। এই কবিতায় চিত্রকল্পে অভিনবত্বের দিকগুলি সূত্রাকারে তুলে ধরা হলো। প্রথমত, কবি আকাশের মেঘমালাকে "থোকা-থোকা আরক্তকরবী"র সঙ্গে তুলনা করেছেন। সাধারণত মেঘকে ফুলের সঙ্গে তুলনা করা হলেও এখানে "আরক্তকরবী" শব্দটি ব্যবহারের ফলে আকাশ যেন লাল করবীর রঙে রঞ্জিত হয়ে উঠেছে। এতে প্রকৃতির দৃশ্যটি শুধু দৃশ্যমান নয়, রঙিন ও জীবন্ত হয়ে ওঠে, "উদাসীন মেঘে মেঘে/ ফুটে আছে থোকা-থোকা/ আরক্তকরবী" — এই চিত্রকল্পে মেঘ যেন ফুলে-ভরা বৃক্ষে রূপান্তরিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, "সমস্ত আকাশ যেন গগনেন্দ্র ঠাকুরের ছবি" — এই উপমাটি অত্যন্ত অভিনব। এখানে কবি প্রকৃতির দৃশ্যকে চিত্রকলার সঙ্গে যুক্ত করেছেন। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর আধুনিক ও রঙবহুল চিত্রকলার জন্য পরিচিত। কবির চোখে আকাশ যেন সেই শিল্পীর আঁকা বিমূর্ত ও রঙসমৃদ্ধ এক ক্যানভাস। ফলে কবিতার চিত্রকল্পে সাহিত্য ও চিত্রকলার এক আন্তঃসম্পর্ক তৈরি হয়েছে। তৃতীয়ত সাঁওতালি মেয়েদের উপস্থিতি কবিতায় লোকজ জীবনের স্বাদ এনেছে। "ঝাঁকে-ঝাঁকে" শব্দবন্ধে

© Santiniketan Sahityapath

তাদের দলবদ্ধ চলাচলের দৃশ্য জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ধানকলের শ্রমজীবী মেয়েরা ‘‘দাদারিয়া গানে-গানে’’ করবী ফুল তুলে এনে খোঁপায় গুঁজে রাখছে — এই দৃশ্যটি শ্রম ও সৌন্দর্যের এক অপূর্ব মিলন ঘটায়। লোকসংগীত, শ্রমজীবন ও প্রকৃতির রঙ একত্রে মিশে এখানে এক চলমান চিত্ররূপ সৃষ্টি করেছে। সবশেষে, ‘‘এইবার ঘরে ফেরে’’ — এই পঙ্‌ক্তি পুরো দৃশ্যটিকে একটি পূর্ণতা দেয়। দিনের শ্রম শেষে প্রকৃতির সৌন্দর্যকে সঙ্গে নিয়ে মেয়েদের ঘরে ফেরা যেন এক শান্ত, স্নিগ্ধ চলচ্চিত্রের শেষ দৃশ্যের মতো মনে হয়। এই কবিতাংশের চিত্রকল্পের অভিনবত্ব নিহিত রয়েছে প্রকৃতি ও শিল্পকলার সংমিশ্রণ, রঙের ব্যবহার, লোকজ জীবনের সজীব উপস্থাপনা এবং দৃশ্যকে চলমান ছবির মতো ফুটিয়ে তোলার অসাধারণ ক্ষমতার মধ্যে।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের কবিতার বিষয়ের মধ্যে বিশ্ব নাগরিক চেতনা প্রবল ভাবে দেখা যায়। তিনি কেবল বাংলা বা ভারতীয় জীবনের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেন নি; তাঁর কাব্যচিন্তা বিস্তৃত হয়েছে সমগ্র পৃথিবীজুড়ে। দেশ, ভাষা, সংস্কৃতি ও জাতির সংকীর্ণ সীমারেখা অতিক্রম করে তিনি মানুষের সার্বজনীন অস্তিত্বকে উপলব্ধি করেছেন। শৈশবে রিখিয়া থেকে শান্তিনিকেতন এবং কলকাতা হয়ে জার্মানির হাইডেলবার্গে দীর্ঘ দিন বসবাস করছেন। এছাড়া কবিতা লেখার সূত্রে দেশ-বিদেশে ভ্রমণ এবং বিশেষত পৃথিবীর বিভিন্ন কবিদের কবিতা অনুবাদ চর্চায় সূত্রে তাঁর সৃষ্টিতে বিশ্ব নাগরিক চেতনার সুর প্রবল ভাবে ধরা পড়েছে বলেই আমার মনে হয়। অনুবাদ প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে যায় ১৩৬৯ বঙ্গাব্দে কবি বন্ধু শঙ্খ ঘোষকে নিয়ে রচিত তাঁর বিখ্যাত, ‘সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত’ গ্রন্থটির কথা। বিশ্ব নাগরিকতার বোধ তাঁর একটি কবিতায় সরাসরি এসেছে। আমরা সেই কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করছি।

‘‘দেশ-বিদেশে বাসা আমার যখনই যাই-আসি
হাতে আমার বেউড় বাঁশের বাঁশি
বাজাতে গিয়ে ঠোঁট ছড়ে যায় সুরের রক্তে বাঁশি ভেজায়
জন্মদিনের জামা আমার।
রক্তে যখন ভাসি
কেউ বলে সংসারী আমি কেউ বলে সন্ন্যাসী!’’[৭]

উদ্ধৃত কবিতাংশে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের বিশ্বনাগরিক চেতনার এক গভীর ও কাব্যিক প্রকাশ ঘটেছে। এখানে কবি নিজেকে কোনো নির্দিষ্ট দেশ, সমাজ বা পরিচয়ের মধ্যে আবদ্ধ রাখেন নি; বরং সমগ্র পৃথিবীকেই নিজের বাসস্থান হিসেবে কল্পনা করেছেন, ‘‘দেশ-বিদেশে বাসা আমার যখনই যাই-আসি’’ — এই পঙ্‌ক্তিতেই কবির বিশ্বনাগরিক মানসিকতা স্পষ্ট। তিনি কেবল নিজের দেশেই নন, বিদেশেও সমান স্বচ্ছন্দ। পৃথিবীর নানা দেশ ও সংস্কৃতির মধ্যে তাঁর অবাধ বিচরণ। ফলে তাঁর পরিচয় কোনো সংকীর্ণ জাতীয় সীমানায় সীমাবদ্ধ নয়; তিনি বিশ্বমানবের প্রতিনিধি। কিন্তু এই বিশ্বজনীনতার মধ্যেও কবি নিজের শিকড়কে ভুলে যাননি, ‘‘হাতে আমার বেউড় বাঁশের বাঁশি’’ — এখানে ‘‘বেউড় বাঁশের বাঁশি’’ বাংলার লোকজ সংস্কৃতির প্রতীক। অর্থাৎ বিদেশে ঘুরলেও তিনি নিজের দেশীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে সঙ্গে বহন করেন। বিশ্বনাগরিক হলেও তিনি আত্মপরিচয়হীন নন; বরং দেশীয় সংস্কৃতিকেই বিশ্বপরিসরে বহন করে চলেছেন, ‘‘বাজাতে গিয়ে ঠোঁট ছড়ে যায়/ সুরের রক্তে বাঁশি ভেজায়’’ — এই চিত্রকল্পে শিল্পসাধনার যন্ত্রণা ও আত্মনিবেদনের পরিচয় পাওয়া যায়। কবি বিশ্বমানবতার সুর সৃষ্টি করতে গিয়ে নিজের রক্ত, বেদনা ও জীবন ঢেলে দিয়েছেন। তাঁর শিল্প ব্যক্তিগত সীমা অতিক্রম করে সার্বজনীন মানবিক অনুভূতির রূপ নিয়েছে, ‘‘কেউ বলে সংসারী আমি কেউ বলে সন্ন্যাসী’’ — এই পঙ্‌ক্তিতে কবির দ্বৈত পরিচয় ফুটে উঠেছে। তিনি যেমন জগতের সঙ্গে যুক্ত, তেমনি এক অর্থে সব সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বেও অবস্থান করেন। এই দ্বৈততা বিশ্বনাগরিক মানুষের বৈশিষ্ট্য — যিনি সর্বত্র আপন, আবার কোথাও সম্পূর্ণ আবদ্ধ নন।

বিশ্ব নাগরিক চেতনা সম্পন্ন দুজন কবির কথা এই প্রসঙ্গে মন পড়ে যেতে পারে। একজনের নাম অমিয় চক্রবর্তী এবং অন্যজন অবশ্যই অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। অমিয় চক্রবর্তী এবং অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত — উভয় কবির কবিতাতেই বিশ্বনাগরিক চেতনার প্রকাশ লক্ষ করা যায়। দু’জনেই দেশ ও জাতির সংকীর্ণ সীমা অতিক্রম করে বিশ্বমানবতার দৃষ্টিতে মানুষ ও সভ্যতাকে দেখেছেন। বিদেশভ্রমণ,

© Santiniketan Sahityapath

বহুভাষা ও বহুসংস্কৃতির সংস্পর্শ তাঁদের কাব্যচেতনাকে আন্তর্জাতিক মাত্রা দিয়েছিল। কিন্তু এই মিল থাকা সত্ত্বেও তাঁদের সময়, অভিজ্ঞতা ও কাব্যদৃষ্টির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে।

অমিয় চক্রবর্তীর সময় ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ঔপনিবেশিক সংকট ও মানবসভ্যতার বিপর্যয়ের সময়। তাই তাঁর বিশ্বনাগরিকতা মূলত মানবতাবাদী ও শান্তিকামী। মানুষের আত্মিক মুক্তি, বিশ্বশান্তি এবং মানবপ্রেম তাঁর কবিতার প্রধান সুর। তাঁর কবিতায় রবীন্দ্র-উত্তর উদার মানবতাবাদের প্রভাব প্রবল। পৃথিবীর নানা দেশ ঘুরেও তিনি মানুষের অন্তরের ঐক্য ও আধ্যাত্মিক বন্ধনের দিকটি বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। অন্যদিকে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের সময় ছিল আরো আধুনিক, জটিল ও অস্তিত্বসংকটময়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী ইউরোপীয় সমাজ, আধুনিক নগরসভ্যতা, বিচ্ছিন্নতা এবং বহুসাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা তাঁর কবিতাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। ফলে তাঁর বিশ্বনাগরিকতা কেবল মানবতাবাদে সীমাবদ্ধ নয়; সেখানে আধুনিক মানুষের নিঃসঙ্গতা, সাংস্কৃতিক ভাঙন, শিল্প-সাহিত্যের আন্তর্জাতিক বিনিময় এবং অস্তিত্ববাদী বোধও যুক্ত হয়েছে। অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় বিশ্বমানবতার বোধ অনেক বেশি শান্ত, স্নিগ্ধ ও আশাবাদী; পক্ষান্তরে অলোকরঞ্জনের কবিতায় তা অনেক বেশি বৌদ্ধিক, প্রতীকধর্মী ও আধুনিক মননের জটিলতায় সমৃদ্ধ। অমিয় যেখানে বিশ্বকে আত্মীয়তার বন্ধনে দেখতে চান, অলোকরঞ্জন সেখানে বিশ্বসভ্যতার বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতা ও সাংস্কৃতিক সংঘাতকেও তুলে ধরেন।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের কবিতায় আধুনিক বিশ্বের নানা সংকট গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। বিশেষ করে শরণার্থী, উদ্বাস্তু জীবন, দেশচ্যুতি এবং আত্মপরিচয়ের সংকট তাঁর কবিতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী পৃথিবী, দেশভাগ, রাজনৈতিক অস্থিরতা ও মানুষের ক্রমবর্ধমান বিচ্ছিন্নতার অভিজ্ঞতা তাঁর কাব্যচেতনাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল, 'আয়না যখন নিশ্বাস নেয়' কাব্যগ্রন্থের 'শরণার্থীর আর্জি' কবিতাটিতে এই বিষয়গুলি প্রত্যক্ষভাবে উঠে এসেছে। আমরা এই কবিতাটি থেকে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃতি হিসেবে ব্যবহার করব,

"দূতাবাসগুলি দাঁড়িয়ে রয়েছে কেন?
যেহেতু দেবে না ভিসা —
শুধু এটুকুই ওদের ভূমিকা, শরণার্থীর আর্জি নামঞ্জুর
করার জন্যে নিযুক্ত আছে রাজদূত আর হাজার দুই মনীষা।
...
বন্ধুরা ছিল থাকবার বাড়ি, এখান-সেখানে আছে
অঢেল সুপার মার্কেট, টেলিফোন,
ইলেকট্রনিক ডাকঘর, তবু প্রবেশাধিকার নেই
এই কথাটাও জানায় না কেউ, কেন?"[৮]

উদ্ধৃত কবিতাংশে কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত আধুনিক বিশ্বের শরণার্থী ও উদ্বাস্তু মানুষের অসহায়তা, অপমান এবং পরিচয়হীন জীবনের গভীর সংকটকে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ ও বেদনাবোধের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। এখানে কবির দৃষ্টিভঙ্গি কেবল ব্যক্তিগত নয়; এটি সমগ্র বিশ্বব্যবস্থার অমানবিকতার বিরুদ্ধে এক মানবিক প্রতিবাদ।কবিতার শুরুতেই কবি প্রশ্ন তুলেছেন — "দূতাবাসগুলি দাঁড়িয়ে রয়েছে কেন?/ যেহেতু দেবে না ভিসা — " এই প্রশ্নের মধ্যেই শরণার্থীর অসহায় বাস্তবতা ধরা পড়েছে। দূতাবাস সাধারণত দুই দেশের সম্পর্ক ও মানুষের যাতায়াতের সেতু হিসেবে কাজ করে; কিন্তু কবির চোখে এগুলি মানবিক সহায়তার প্রতীক নয়, বরং নিষেধাজ্ঞা ও প্রত্যাখ্যানের প্রতীক, "ভিসা দেবে না" — এই বক্তব্যে রাষ্ট্রব্যবস্থার নির্মমতা প্রকাশিত হয়েছে। উদ্বাস্তু মানুষের কাছে রাষ্ট্র যেন কেবল বন্ধ দরজার নাম, "শরণার্থীর আর্জি নামঞ্জুর করার জন্যে/ নিযুক্ত আছে রাজদূত" — এই পঙ্‌ক্তিগুলিতে তীব্র বিদ্রুপ রয়েছে। এখানে কূটনীতি ও সভ্যতার মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে থাকা নিষ্ঠুর মানসিকতাকে কবি উন্মোচন করেছেন। "হাজার দুই মনীষা" থাকা সত্ত্বেও

© Santiniketan Sahityapath

মানবিক সমাধান আসে না — অর্থাৎ উন্নত সভ্যতা ও জ্ঞানচর্চা থাকা সত্ত্বেও পৃথিবী শরণার্থীর প্রতি সহানুভূতিশীল হতে পারেনি। কবিতাটির শেষাংশে কবি আরো গভীর এক উদ্বাস্তু সংকটের কথা বলেছেন — "বন্ধুরা ছিল থাকবার বাড়ি... তবু প্রবেশাধিকার নেই" — এখানে বোঝানো হয়েছে, পৃথিবীতে পরিচিত মানুষ, আধুনিক নগরসভ্যতা, প্রযুক্তি, সুপার মার্কেট, টেলিফোন—সবই আছে, কিন্তু শরণার্থীর জন্য কোথাও আশ্রয় নেই। অর্থাৎ আধুনিক সভ্যতা বস্তুগতভাবে সমৃদ্ধ হলেও মানবিকতার দিক থেকে দেউলিয়া। উদ্বাস্তু মানুষ প্রযুক্তি ও উন্নয়নের পৃথিবীতেও বহিরাগত এবং অবাঞ্ছিত, "এই কথাটাও জানায় না কেউ, কেন?" — শেষ প্রশ্নটি গভীর অস্তিত্বসংকটের ইঙ্গিত বহন করে। শরণার্থী কেবল রাষ্ট্রচ্যুত নয়, সে যেন পরিচয়চ্যুতও। তাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়, কিন্তু কেন করা হয় সেই উত্তরও সে পায় না। এই নীরবতা ও অনিশ্চয়তাই উদ্বাস্তু জীবনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি।

সবশেষে বলা যায় যে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত বাংলা আধুনিক কবিতায় বিষয় ও প্রকরণের দিক থেকে এক স্বতন্ত্র এবং অভিনব কণ্ঠস্বর। তাঁর কবিতায় যেমন প্রেম, ঈশ্বরচেতনা, দেশভাগ, নির্বাসন, মানবিক সংকট, মৃত্যু ও অস্তিত্ববোধের মতো গভীর বিষয় এসেছে, তেমনি সেই বিষয়গুলিকে প্রকাশ করার জন্য তিনি নির্মাণ করেছেন এক অনন্য কাব্যভাষা ও প্রকরণ। চিত্রকল্পের অভিনব ব্যবহার, শব্দের ব্যঞ্জনা, দার্শনিকতা, বহুসাংস্কৃতিক অনুষঙ্গ, প্রতীক ও ইঙ্গিতনির্ভর প্রকাশভঙ্গি তাঁর কবিতাকে দিয়েছে স্বতন্ত্র মর্যাদা।

তথসূত্র:

১। 'কবিতাসমগ্র', ১ম খণ্ড, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, প্রমা প্রকাশনী, ৫ ওয়েস্ট রেঞ্জ,কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১ বৈশাখ ১৩৫৯, পৃ. ১৭
২। ওই, পৃ. ৫১
৩। 'সোনার তরী', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১০ প্রিটোরিয়া স্ট্রিট, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৩৮৪, পৃ. ৫৯
৪। 'কবিতা সংগ্রহ', ২য় খণ্ড, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, মার্চ ২০২১, পৃ. ৭১
৫। 'মরুপথিক', নীলাব্জ দাস সম্পাদনা, রাধে রেসিডেন্সি, ফ্ল্যাট বি ৩, তিন তলা, ৯৫ মহাজাতি নগর, ব্লক ৪, বিরাটি, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০১৮, পৃ. ২৬
৬। 'কবিতাসমগ্র', ১ম খণ্ড, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, প্রমা প্রকাশনী, ৫ ওয়েস্ট রেঞ্জ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১ বৈশাখ ১৩৫৯, পৃ. ৭১
৭। 'কবিতা সংগ্রহ', ২য় খণ্ড, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, মার্চ ২০২১, পৃ. ১০৬
৮। 'কবিতা সংগ্রহ', ৩য় খণ্ড, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুআরি ২০১৭, পৃ. ১৯৯

—

© Santiniketan Sahityapath